দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..... 3 JUL 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

গণসাক্ষরতার প্রকৃত চিত্র

গণসাক্ষরতা আন্দোলনের হোঁচট খাইবার উপক্রম হইয়াছে মাঝ পথে। অভীষ্টে পৌঁছুইবার আগেই টোটাল লিটারেসি মুভমেন্টের যবনিকাপাত ঘটিবার আলামত দেখা যাইতেছে। টিএলএম-এর বর্ধিত মেয়াদ শেষ হইবার কথা ৩০শে জুন। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের পাঁচ বৎসর মেয়াদী কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয় ১৯৯৪ সালে। ২০০১ সালের জুনে মেয়াদ শেষ হইলেও দুই বৎসর বাড়াইয়া চলতি বৎসরের জুন পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল দেশের সব কয়টি জেলার ১১ হইতে ৪৫ বৎসর বয়সী সকলকে সাক্ষর করিয়া তোলা। সাক্ষর মানে কেবল নাম-দস্তখত করিতে পারা নয় বরং চিঠি লেখা ও পড়িতে পারার মত জ্ঞানকে বুঝান হইয়াছে। ইতিমধ্যে ঘটা করিয়া সাতটি জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। আরও দুইটি জেলাকে নাকি শীঘ্রই নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হইবে। সেই প্রস্তুতি সম্পন্ন প্রায়। অন্য ৭টি জেলায় প্রকল্পের কাজ চলিতেছে পুরাদমে। ১০টিতে গণসাক্ষরতা অভিযান শুরু হইবে শীঘ্রই। বাকী ১৭টি জেলায় এখনও গণসাক্ষরতা আন্দোলনের ছোঁয়া লাগে নাই। সরকারী হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৫ দশমিক ৫ ভাগ। সবার জন্য শিক্ষা এবং সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের লক্ষ্য ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে জাতিকে মুক্তি দেওয়া। সরকারী পরিসংখ্যানের যথার্থতা নিয়া প্রশ্ন রহিয়াছে। যদি ইহাকে বস্তুনিষ্ঠ বলিয়া ধরিয়াও নেওয়া হয়, তাহা হইলেও সার্বিক সাক্ষরতা অর্জন এখনও বহুদূর। ইহারই মাঝখানে কর্মসূচীটি বন্ধ করিয়া দিবার কথা ভাবা হইতেছে। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচীতে ইতিমধ্যে আড়াইশত কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই তুলনায় প্রকৃত সাফল্যের মাত্রা নগণ্য। যে কয়টি জেলাকে ইতিমধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সেইসব জেলার প্রতিটি নারী-পুরুষ যথার্থ সাক্ষর হইয়া উঠিয়াছেন কিনা তাহাও সন্দেহাতীত নয়। এই প্রশ্নের ভিন্নমত রহিয়াছে। সরকারী পরিসংখ্যানে সাক্ষরতার যে হার দেখান হয় সেও তথ্যভিত্তিক নয় বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। ২০০১ সালে বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত দেশব্যাপী শিক্ষা জরিপে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪২ শতাংশ। পরবর্তী দেড়-দুই বৎসরে সাক্ষরতার হার খুব বেশী বাড়িয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত তেমন কোনো জোরাল যুক্তি নাই।

অশিক্ষার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম বহুকাল ধরিয়া। এই উপমহাদেশে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দিবার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯১৮ সালে। পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেও নৈশ বিদ্যালয় চালু ছিল। শহর ও গ্রামের অনেক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং স্থানীয় ক্লাব-সমিতি স্বপ্রণোদিত হইয়া বহু স্থানে বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় চালাইত। একালে অবশ্য বিষয়টি সেইরকম নাই। দৃশ্যত বিষয়টি এখন আরও অনেক বেশী নিবিড় এবং সরকার সংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। এইখাতে অর্থায়নের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে বহুলাংশে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগটিকে মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। গণশিক্ষা অর্থাৎ সকলের জন্যে শিক্ষা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার গ্রহণ করিয়াছেন বিবিধ কার্যক্রম। ১৯৯১ সালে গ্রহণ করা হয় সমন্বিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্ষেপে ইনফেম। টিএনএম সম্ভবত ইনফেমেরই অংশ।

এত কিছুর পরেও সাক্ষরতা অভিযানের লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ, মহল বিশেষের দুর্নীতি ও অনিয়ম। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নামে সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে মধ্যস্বত্বভোগী একটি শ্রেণী নাকি অনিয়মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া চলিয়াছে বহু ক্ষেত্রে। এই সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে অনেক রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে। একশ্রেণীর ভুঁইফোড় এনজিও নানা কৌশলে গণসাক্ষরতার ঠিকা নিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া চলিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। মাঝখান হইতে গণশিক্ষার মত একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের মাঝে তৈয়ার হইয়াছে ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা। পরিণতিতে গণসাক্ষরতা আন্দোলন নথিপত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে বহু ক্ষেত্রে। অথচ এই কর্মসূচীটিকে সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিতে না পারিলে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করা বাস্তবিকই কঠিন।■